মূলপাতা

অশ্রুভেজা ডায়েরি

আফীফা আবেদীন সাওদা

2021-04-16 20:10:51 +0600 +0600

11 MIN READ

জানুয়ারী ১৯৯১

রাত বাজে আড়াইটা। মেঝেতে খানিকক্ষণ এপাশ ওপাশ করে ক্ষান্ত দিলাম। ঘুম আর আসবেই না। চোখটা লেগে এসেছিল একবার। শুনতে পেলাম বিছানা থেকে মা কোঁকাচ্ছেন, 'শিউলি... ও শিউলি...'

আমি উঠতে-না-উঠতেই বিছানা ভাসিয়ে ফেললেন মা। তাকে পরিষ্কার করালাম, বিছানা পরিষ্কার করলাম। চাদর, কাঁথা সব ধুয়ে দিলাম যাতে সকালের মধ্যেই শুকিয়ে যায়। যত দ্রুত সম্ভব বিছিয়ে দিতে হবে। মা আমার খালি তোশকে রাত কাটাচ্ছেন। এই রাতের বেলা চাদরের জন্য ভাইয়া-ভাবির ঘুম ভাঙানো যাবে না।

প্রায়ই এমন হয়। একটাই সান্ত্বনা, এই শীতের রাতেও দরদর করে ঘামেন আমার মা। লেপ-কম্বল লাগে না। কখনও-সখনও কাঁথা গায়ে দেন, আবার আমাকে ডাকেন কাঁথাটা সরিয়ে দিতে।

আমি কাঁথা সরিয়ে দিই। ঘামে ভেজা মাকে তালপাখা দিয়ে বাতাস করি। মাঝে মাঝে অতি সাহস করে ফ্যান ছেড়ে দিই। শীতে কষ্ট পাবার ভয় আমার নেই। ভয়টা ভাই-ভাবিকে নিয়ে।

এক রাতে ফ্যান ছেড়েছিলাম বলে কী তুলকালাম! পুরাতন ফ্যানের ঘটঘট আওয়াজ শুনে ভাই দৌড়ে এলো।

'এই শীতের রাতে ফ্যান কেন? বিদ্যুত বিল বাড়াতে চাস? ভাইয়ের সবটা খেয়ে-পরেও পোষাচ্ছে না?'

বদ্ধ পুকুরের শান্ত পানির চেয়েও শান্ত গলায় বলেছিলাম, 'তোমারটা খাচ্ছি না। বাবা যে সম্পত্তি রেখে গেছেন তাতে আমার খাওয়া-পরার খরচ উঠে আরও থেকে যাবে। আমি আর কতটুকুই খাই, কতটুকুই বা পরি? দুই ঈদে একটা করে জামা পাই, তাও মামার কাছ থেকে। তোমার থেকে কিছুই নিচ্ছি না। নিশ্চিন্তে ঘুমাতে যাও।'

ততক্ষণে ভাবিও এসে হাজির। চুপ থাকলেই পারতাম। মুখে মুখে তর্কের অপরাধে জল অনেক দূর গড়ালো। সে-রাতে কেউ ঘুমায়নি। বাড়ির বহু পুরোনো ইতিহাস, কার কত অবদান, কে বসে খায় আর কে ঘাম ঝরায় ইত্যাদি তর্কেরাত পেরিয়ে ভোর। তর্কেজিতল ভাই আর ভাবি। আমার শোচনীয় পরাজয়। প্রমাণিত হয়ে গেছে, এ সংসারে আমি শুয়ে বসে কেবল অন্ন ধ্বংস করে যাচ্ছি। সেইসাথে পিতৃসম বড়ভাইয়ের মুখে মুখে তর্ককরে তার প্রতিদান দিচ্ছি। দুনিয়ায় যাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি, সেই মা-ও কথা বললেন না পাক্কা দুই দিন।

এরপর থেকে উচিত কথা গিলে ফেলতে শিখেছি। চুপচাপ শুনে যাই। যে যা বলে মেনে নিই। তালপাখা নাড়াতে নাড়াতে হাতটা অবশ হয়ে আসলে সাহস করে ঘটঘটে ফ্যানটা একটুখানি ছেড়ে দিই। আমার সাহসের দৌড় অতটুকুই।

মনকে মানিয়ে নিয়েছি। বাবার রেখে যাওয়া বাড়িতে যে খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে পারছি সে-ই ঢের। পশ্চিমের আলো বাতাসহীন ঘরটা আমাদের। আমার আর মায়ের। আমরা দুজন এ ঘরেই সংসার পেতেছি।

দরজার ওপারে আলাদা একটা জগত। আলাদা সংসার। সেখানে ভাই, ভাবি আর আমার আদরের ভাতিজি তুলতুলির বসবাস। সে সংসারেও আমার একটা অবস্থান আছে বটে! আমি সেখানকার বেতনবিহীন কাজের বুয়া। সারাটা দিন দৌড়ে কাটে আমার। তুলতুলি এক পেরিয়ে দুইয়ে পা রাখল। দিনের অনেকটা সময় তাকে দেখে রাখতে হয়।।

ভাবির মাস্টার্স প্রায় শেষের পথে। এরপর চাকরিতে ঢুকে যাবে। তার ছোট চাচা আগে থেকেই ব্যবস্থা করে রেখেছেন। মাস্টার্সটা শেষ করলেই জয়েনিং। সে সময় তুলতুলিকে হয়তো সারাদিন দেখে রাখতে হবে। কাকে ছেড়ে কাকে দেখব? মাকে, নাকি তুলতুলিকে?

অগাস্ট ১৯৯১

বহুদিন পর একটু অবসর পেলাম। তুলতুলিকে নিয়ে ভাবি গেছে বাপের বাড়ি। আজ বিকেলেই গেল। যাবার আগে মায়ের সাথে বেশ গল্প করল দেখলাম। আমি অবশ্য ব্যস্ত ছিলাম তুলতুলিকে গোসল করাতে।

গোসল শেষে রান্নাঘরে ঢুকে গেলাম। মনটা বেশ উড়ুউড়ু। এতদিনের স্বপ্ন পূরণের বার্তা পেয়েই হয়তো! বাবা মারা যাবার পর আমার বিয়ের সম্বন্ধ আসেনা বললেই চলে। বেঁচে থাকতে একের পর এক সম্বন্ধ আসত। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার। তখন মাত্র ইন্টার পরীক্ষা দিয়েছি। একে একে সব প্রস্তাব নাকচ করে দিতেন বাবা। পড়াশোনা শেষ করে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে দিতে চান না তিনি।

ফুফুদের দেখেছেন সংসারে একটা পরিচয়ের অভাবে, ডিগ্রির অভাবে মানবেতর জীবন-যাপন করতে। ভাই হিসেবে চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া কিছুই করার ছিল না তার। মেয়েকেও সেই একই জীবনের দিকে ঠেলে দিতে চাননি।

যে-সমাজের মানদণ্ড এত নীচ; যে-সমাজ ডিগ্রি থাকলেই, চাকরি থাকলেই মাথায় তুলে রাখে, নতুবা নয়; সে-সমাজকে কেন যেন আমরা শুধরে যেতে বলি না। উল্টো সমাজের মানদণ্ডে উতরে যেতে নিজেকেই কারাদণ্ড দিয়ে বসি।

ডিগ্রি নিতে আমার অনিচ্ছা ছিল না, আপত্তিও ছিল না। ওদিকে জীবনসঙ্গীর অভাবটাও তাড়িয়ে বেড়াত। ওই যে বললাম—সমাজের কথা, যা সুচতুরভাবে ডিগ্রি আর বিয়ের মাঝে সংঘাত ঘটিয়ে দিয়েছে। হয় ডিগ্রি, নয়তো বিয়ে।

বাবা মারা যাবার পর মা পড়ে গেলেন বিছানায়। বাবার স্বপ্ন পূরণ হলো না আর। আমি পড়াশোনা বাদ দিয়ে ঘরে রয়ে গেলাম মায়ের দেখাশোনা করতে। অসুস্থ মায়ের যতক্ষণ হুশ আছে ততক্ষণ আমার জন্য আক্ষেপ। কেন যে সম্বন্ধগুলো বাতিল করে দিয়েছিলেন বাবা! আমার ভবিষ্যৎ চিন্তায় চোখে অন্ধকার দেখেন মা। ভয় পান, তার কথা ভেবে না-জানি আজীবন কুমারী থেকে যাই।

‘মা রে, তুই আমার জন্য চিন্তা করিস না। আল্লাহ আছেন। তিনিই ব্যবস্থা করে দেবেন।’

প্রতিদিন সকাল-বিকাল একই কথা জপেন। একজন সঙ্গীর অভাবে আমারও প্রাণ কাঁদে। মায়ের চিন্তায়ও ঘুম আসে না। আমি চলে গেলে ভাই-ভাবি কি মাকে দেখবে? কত রকমের স্বপ্ন দেখি। বিয়ের পর স্বামীকে বলে মায়ের জন্য একটা নার্স রেখে দেব। জটিল সব টানাপোড়েনে দিন কাটে। সমস্যার শেষ নেই, সমাধান অজানা।

গতকাল বিকেলে সোহেলী আপা এলো বাড়িতে। আমার জন্য সম্বন্ধ এনেছেন। পাত্রপক্ষের সবদিকই আমাদের পরিবারের সাথে মিলে যায়। আপত্তি করবার জায়গা নেই। এতদিন টুকটাক যে ক-টা সম্বন্ধ আসত, ভাই-ভাবি নাকচ করে দিয়েছেন নানান ছুতোয়। এটা মেলে, তো সেটা মেলে না। এই পাত্রের বেলায় ভাইয়াও বলে বসল, ‘ছেলে তো বেশ ভালোই!’

এরপর বিয়ে নিয়ে কদ্দূর কথা হয়েছে জানি না। আজ দুপুরে ভাবি কি আমার বিয়ে নিয়েই আলাপ করছিল? জানা নেই। রান্নাবান্না সেরে, ঘরদোর গুছিয়ে অবসর পেলাম পড়ন্ত বিকেলে। এক কাপ চা নিয়ে মায়ের মুখোমুখি বসেছি। গতকাল বিয়ের সম্বন্ধ আসার পর থেকেই মায়ের মুখটা ঝলমল করছিল। রুগ্ন-ভগ্ন শরীরের সব কষ্ট ছাপিয়ে মেয়ের একটা গতি হচ্ছে সেই আনন্দ দেখেছিলাম তার চোখে-মুখে। অথচ আজ যেন কোথায় কী নেই।

চোখটা কি চিকচিক করছে মায়ের? এগিয়ে এসে হাত দুটো ধরলাম। এই হাতে একা সংসার সামলেছেন একসময়। আর এই হাত এখন কতটা অসহায়!

হাত ধরতেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন মা।

‘মা রে তুই আমার আদরের মেয়ে! শ্বশুরবাড়িতে তোর কোনো কষ্ট সইতে পারব, বল? এই বিয়েটা করিস না মা।’

এক দিনের ব্যবধানে মায়ের আমূল পরিবর্তন। থমকে গেলাম। চোখের সামনে মেয়ের কষ্ট সইতে পারেন যিনি, চোখের আড়ালে শ্বশুরবাড়ির কষ্টে তার এত ভয়!

ফেব্রুয়ারি ১৯৯২

ভাবির ছোট বোন শিল্পীর বিয়ে হলো আমাদের বাড়িতে। ভাবির আবদার। তাদের সেই ভাড়া-বাড়িতে বিয়ের আয়োজন সম্ভব না। আমাদের বাবার রেখে যাওয়া বাড়িটা ভাঙাচোরা হলেও নিজের বাড়ি তো! বাড়িওয়ালার খবরদারি নেই, যখন তখন নোটিশেরও ভয় নেই।

এই কয়দিন গায়ে হলুদের খাটাখাটনি করে ক্লান্ত-শ্রান্ত আমি। গা এলিয়ে একটু শোবার ফুসরত মেলেনি। ফুল দিয়ে ঘর সাজানো, আলপনা আঁকা; সব নিজ হাতে করেছি। সাথে ছিল তুলতুলি। ফুপির কোল ছাড়ে না।

চারিদিকে কী আনন্দ, কী হইচই! সবার চোখে-মুখে খুশির জোয়ার। কেবলই আমারই ফাঁকা-ফাঁকা লাগছিল ভীষণ। নাহ, অন্যের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, আমার হচ্ছে না—এমন ঈর্ষা থেকে নয়। পাত্রের নাম-ধাম জেনে গিয়েছিলাম। সেই থেকে শরীরের সাথে সাথে ভারী মনটাকেও টেনে নিয়ে চলছি।

পাত্র সেই ব্যক্তি, যার সম্বন্ধ আমার জন্য এসেছিল, যার ব্যাপারে আমার উন্নাসিক ভাইও বলেছিল, ‘ছেলে তো বেশ ভালোই।’

একে একে সব রহস্যের জট খুলে গেল। সম্বন্ধ আসবার পর কেনই বা আমার ব্যস্ত ভাবি মায়ের সাথে এত গল্প জুড়ে দিল? কেনই-বা তড়িঘড়ি করে বাপের বাড়ি ছুটল! মাকে ভাবি কী বলেছিল—তা জানি না। কেবল ফলাফলটা জানি!

পৃথিবীতে কিছু রহস্যের জট না খুললেই বুঝি ভালো! এক ধাক্কায় সব রহস্য ভেদ হয়ে যাবার ভার সইতে পারলাম না। বিয়েবাড়ির হই হুল্লোড় শেষ হতেই নিস্তেজ হয়ে পড়লাম। কিছুই ভালো লাগে না আর। মায়ের ওপরও ভীষণ রাগ হয় মাঝে মাঝে। পরক্ষণেই ভাবি—কতটা অসহায় আমার মা! কতটা অসহায়! বিছানায় পড়ে-থাকা মা আমার! তার ওপর রাগ করে কী লাভ!

নভেম্বর ১৯৯৫

ট্রাংক খুলে কাগজপত্র ঘাঁটছিলাম। হুট করে পেয়ে গেলাম ডায়েরিটা। পেয়েই যখন গেলাম, আবার না-হয় লিখি।

মা চলে গেছেন বছরখানেক হলো। যখন তখন ‘শিউলি শিউলি’ বলে কেউ ডাকে না আর। প্রথম প্রথম খুটখাট শব্দেও জেগে যেতাম ঘুম থেকে। মা কি টয়লেটে যাবে? পানি খেতে চায়? ঘুম ঘুম চোখে শূণ্য বিছানা দেখে আঁৎকে উঠতাম। মা কই?

এখন অবশ্য নতুন জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। ভাবি অফিসে চলে যায়, সন্ধ্যায় ফেরে। ভাইও তাই। এত বড় বাড়িতে আমি আর তুলতুলি একা। এই সময়টা মায়ের অভাব খুব অনুভব করি। মা থাকলে কারণে-অকারণে ডেকে ডেকে হয়রান করত।

সেই হয়রানির জন্য মন কাঁদে।

দিনের অর্ধেকটা কাটে তুলতুলির সঙ্গে। সে কখনও ফুপি কখনও শিউলি ডেকে মায়ের অভাব পূরণ করে।

জীবন এভাবেই কেটে যাচ্ছে। হাতে অখণ্ড অবসর। বারান্দা দিয়ে মানুষের যাতায়াত দেখি। হট-প্যাটিসওয়ালা কাঁচের বাক্সে করে প্যাটিস নিয়ে যায়। ছোট্ট গোল হাওয়াই মিঠাই কিনতে এ বাড়ি ও বাড়ির বাচ্চারা পুরোনো হাঁড়ি-পাতিল নিয়ে হাজির হয়। কাগজে করে চারটা হাওয়াই মিঠাই আমিও কিনেছিলাম। একটা ট্যাপ-খাওয়া কানা পাতিলের বিনিময়ে। গোলাপি মিষ্টি হাওয়াই মিঠাই মুখে দিতেই গলে যায়। আমি খাই, তুলতুলি খায়। জিভে রঙ লেগে মাখামাখি হয়। সেই রঙ তুলতে কতরকম চেষ্টা! ভাবিকে জানানো যাবে না কিছুতেই!

রাস্তায় লোকের অভাব নেই। এতকিছুর মাঝেও সদ্য বিয়ে হওয়া মেয়েটা আর ছেলেটাকে চোখে পড়ে যায়। আমি ওদের ঠিক ঠিক চিনে ফেলতে পারি। একদিন আমারও হবে—সে আশ্বাস আর দিই না নিজেকে। বয়স পঁচিশ পেরিয়ে ছাব্বিশে। বিয়ের প্রস্তাব আসে না আর। আসলেও আমার কান পর্যন্ত পৌঁছায় না। আগে মা ছিল; যার যত প্রস্তাব—লোকে এসে মাকে দিয়ে যেত। এখন মা নেই। প্রস্তাব এলো না গেল সে খবর জানি না।।

ভাইয়া-ভাবির ভাবসাবে মনে হয় না আমার বিয়ে নিয়ে কোনো আশা আছে। বেতনবিহীন কাজের বুয়া যে-আদরে তুলতুলিকে বড় করছে, সেই আদর বেতনভুক্ত বুয়া দিতে পারবে না।

মাঝে মাঝে মন চায় বলি, ঘর জামাই-ই না-হয় হলো! তবুও আমায় একা রেখো না, প্লিজ!

সংকোচে আর লজ্জায় বলা হয় না। নিজের বিয়ের কথা নিজেই বলি কী করে!

জানুয়ারী ২০১৯

প্রায় দুই যুগ পরে ডায়েরি হাতে তুলে নিলাম। ধুলোর আস্তর পড়া ডায়েরি। উইপোকা কাটা ডায়েরি। আগে সময় পেলেই লিখতে বসে যেতাম। একদিন ডায়েরিটা মায়ের পুরনো সিন্দুকে রেখে তালা মেরে দিলাম। আর লিখব না। কী হবে লিখে? চোখের সামনে শুধু অসীম শূণ্যতা দেখি। এই পৃথিবীতে আমার কেউ নেই, কিছু নেই।

মা মারা যাবার পর তুলতুলির পেছনে জীবনটা ব্যয় করে দিলাম। চোখে হারাত আমাকে। বড় হতে হতে ফুপির দাম কমে গেল। সেকেলে ফুপি শুধু সীমা বেঁধে দেয়। ভালো-মন্দের সবক দেয়। আদেশ-নিষেধে আগলে রাখতে চায় সারাটা ক্ষণ। স্বাধীনতার স্বাদ পেতে আমাকে একসময় দূরে ঠেলে দিল সে।

ছোট্ট বুড়িটা আর ছোট নেই। বছর চারেক আগে জিআরই টোফেল দিয়ে হল কাণ্ড। আমেরিকায় যাবে পিএইচডি করতে। মেয়ের জন্য যোগ্য-পাত্র খুঁজে পায় না ভাই-ভাবি। একা একা বিদেশ পাড়ি দিচ্ছে, ফুপি হয়ে আমিই বাদ সাধতে গেলাম। বললাম, বিয়েটা করে যা।

আমার কথা হালে পানি পায়নি। একা একাই পড়তে চলে গেল। তুলতুলির বয়স এখন উনত্রিশ। পাত্র খুঁজে খুঁজে হয়রান তার বাবা-মা। আমেরিকা প্রবাসী উপযুক্ত পাত্রের অভাব। লোকে যা একটু আগ্রহী হয়, বয়স শুনে পিছিয়ে যায়। বায়োডাটাতেই এত বয়স, আসলে না জানি কত!

এর মাঝেই ভাতিজি আমার বিছানায় পড়ে গেল। পিঠে অসম্ভব ব্যথা হয়। চলাচল করতে অসুবিধা। আজ খবর এলো মেরুদণ্ডের হাড়ে যক্ষা হয়েছে তুলতুলির। জীবনে শুনিনি এমন রোগের কথা।

আমার আদরের তুলতুলি! আমার মতোই নিঃসঙ্গ জীবনে নাম লেখাতে চলছে। নিজ-হাতে বড় করেছি ওকে। কখনও এতটুকু কষ্ট পেতে দিইনি। ওর মা-বাবার থেকে ওকে কম ভালোবাসিনি। বদদুআ দেবার প্রশ্নই আসে না! তবে কি বুকচেরা

দীর্ঘনিঃশ্বাসও **তাঁর** দরবারে কবুল হয়ে যায়!

বুকটা খাঁখাঁ করছে। দুনিয়ায় আমার একমাত্র সঙ্গী এই ডায়েরিটা। নিজে থেকে তাকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলাম। আজ উপচে-পড়া-দুঃখ সামলাতে না পেরে আবার হাতে তুলে নিলাম।

ও ঘর থেকে ভাবির আর্তনাদ ভেসে আসছে— 'ও আল্লাহ, জীবনে তো কারও ক্ষতি করিনি! আমার মেয়েকেই কেন এত বড় বিপদ দিলে?'

সত্যিই? সত্যিই কারও ক্ষতি হয়নি? আমার অশ্রুভেজা ডায়েরি যে ভিন্ন সাক্ষ্য দেয়!